যুগান্তর

শিক্ষক রাজনীতিই নষ্ট করেছে ছাত্র রাজনীতি

প্রকাশ : ২৬ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ড. ফেরদৌসী বেগম

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। ফাইল ছবি

আবরার হত্যা বাংলাদেশ নিয়ে আমার সব আশা-ভরসার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। একটি ২২ বছরের ছেলেকে ৬ ঘণ্টা জনবহুল বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে পিটিয়ে হত্যা করার বিষয়টি কোনোভাবে, কোনো যুক্তিতে, কোনো ব্যাখ্যায় মেলানো যায় না।

এটি ৫-১০ মিনিটের ঘটনা নয়, কোনো অন্ধকার গলি-ঘুপচি নয়, কোনো সন্ত্রাসী এলাকাও নয়, খোদ রাজধানী ঢাকায় দেশের একটি সেরা বিদ্যাপীঠের একটি কক্ষে ঘটেছে এ ঘটনা। বুয়েটের শেরেবাংলা

হলের ২০১১ নম্বর রুম, যা টর্চার সেল নামে পরিচিত, সেখানে ৬ ঘণ্টা ধরে ১৯ জন ছেলে যখন এ নির্মম হত্যাকাণ্ডটি ঘটাচ্ছিল, তখন বিভিন্ন হলে ছাত্রছাত্রী, কর্মচারী-কর্মকর্তা, শিক্ষক, প্রভোস্ট মিলে কম করে হলেও হাজার দুয়েক মানুষ ছিল।

অদূরে স্যার সলিমুল্লাহ হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫-২০টি হলের ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন বাসস্থানে অবস্থিত কয়েকশ' শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজেরও অসংখ্য ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। আবরারকে রাত ১০টায় রুম থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর তার রুমমেটরা কেন একবারও তার খোঁজ নিল না, এটা এক বিশাল প্রশ্ন হয়ে আমাকে ভাবাচ্ছে।

এ প্রশ্নের উত্তর আমি কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। পুলিশ এসে যখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলল, তখন প্রভোস্ট ও পুলিশ আরও পুলিশকে খবর দিয়ে কেন আবরারকে হাসপাতালে নিয়ে গেল না- এ প্রশ্নের উত্তর আমাকে কে দেবে? আবরার হত্যার নিরপেক্ষ তদন্ত রিপোর্ট কেউ কখনও কোনোকালে জানতে পারবে না- এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ধরে নিলাম আবরার শিবিরের কর্মী ছিলেন। শিবিরকর্মী হলেও সেও তো মানুষ। তারও তো বাঁচার অধিকার আছে, বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর অধিকার আছে, আত্মসমর্পণের অধিকার আছে। তাহলে টহল পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গেল না কেন? প্রভোস্ট জাফর ইকবাল কেন পলাশী থানায় খবরটা জানালেন না। ভিসি জানার পরও কেন অ্যাকশনে গেলেন না? আবরার হত্যার দায় তারা কীভাবে এড়াবেন? সেদিন রাতে বুয়েটে অবস্থানরত ছাত্রছাত্রীরাও কি এর দায় কোনোভাবে এড়িয়ে যেতে পারে?

আজ বুয়েটের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী আন্দোলন করছে। সেদিন যদি ২০০ ছাত্রছাত্রী বের হতো, তাহলে আবরারকে কি ওই ১৯ জন পিটিয়ে একটি জনবহুল স্থানে হত্যা করতে পারত? কোথায় বসবাস আমাদের? এ কেমন সহপাঠী আমাদের সন্তানদের? মতিউর বা আসাদ মাত্র ৩০ সেকেন্ডের গুলিতে লাশ হয়ে গেলে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান হয়ে যায়, একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে ৫ ঘণ্টা রাজারবাগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের কারণে একটি দেশ যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়ে যায়। সেই দেশে ৬ ঘণ্টা পিটিয়ে কাউকে হত্যা করা অকল্পনীয়।

আমি হত্যাকাণ্ডকে দুঃখজনক, অবাঞ্ছিত ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে কোনোভাবেই ছোট করে দেখতে চাই না। আমি চাই সাউথ আফ্রিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে লেখা সেই লেখাটি স্মরণ করতে- 'একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে প্রথমে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে হবে।' '৯০-এর পর এ দেশে যখন গণতন্ত্রকে সুসংগঠিত করার চেষ্টা চলছে, তখনই আমি গভীরভাবে লক্ষ করেছি দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে হায়েনার কালো হাত গ্রাস করে নিচ্ছে।

বিগত কয়েক বছরে খুন-খারাবি, শিক্ষকদের লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি, মেডিকেল কলেজগুলো ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং এসএসসি, এইচএসসি ও জেএসসির ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস- এসব বিষয় প্রমাণ করে দেয় আমাদের রক্তে কেনা স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

তাই আজকাল প্রায়ই শুনতে পাই ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখতে পাই, যারা এবং যাদের ছেলেমেয়েরা এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোতে মেধায় টিকতে না পেরে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না, তারা বলে- এই সর্বোচ্চ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধ্বংস হয়ে গেছে বলেই তারা তাদের ছেলেমেয়েকে বিদেশ পাঠিয়েছে অথবা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়িয়েছে বা পড়াচ্ছে। কিন্তু সেখানেও হায়েনার কালো হাত বন্ধ নেই। হলি আর্টিজান ঘটনায় যাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে, তারা সবাই এ নামিদামি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। আমি প্রায়ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিসে যাই।

একজন পিয়ন আমাকে বলেছিল, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ভিসি হওয়ার জন্য আমাদের পায়ে ধরতেও বাকি রাখে না।' অধঃপতনটা এখান থেকেই শুরু। আমাদের সময়ও শিক্ষকরা রাজনীতি করতেন, তবে তা কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তির জন্য ছিল না। শিক্ষকরা রাজনীতি করলেও ভিসি, প্রক্টর, প্রভোস্ট বা বিভিন্ন পদ-পদবির জন্য ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কাছে দৌড়াতেন না।

মুক্তিযুদ্ধের আগে ভিসি বা শিক্ষকরা যদি তখনকার ক্ষমতাসীন ইয়াহিয়া, আইয়ুব খানের তাঁবেদারি করতেন, তাহলে বাংলাদেশের ছাত্ররা '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন বা '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ করতে পারত না। যদি লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি হতো তাহলে বোস প্রফেসর মতিন চৌধুরীর মতো প্রফেসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হতেন না। '৯০-এর আগে ভিসি বা শিক্ষকরা একটা আদর্শিক অবস্থানে ছিলেন বলেই মান্না, আখতারুজ্জামানরা জাসদ করেও ডাকসুর ভিপি হয়েছেন। ছাত্র রাজনীতি তখন ভিপি বানাত না।

'৯০-এর পর ছাত্র রাজনীতি দলভিত্তিক, লেজুড়বৃত্তিক হওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রক্টোর, প্রভোস্ট, প্রশাসন এমনভাবে দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে যে, শিক্ষক রাজনীতি এবং ছাত্র রাজনীতি একাকার হয়ে যায়। আদর্শহীন, মেধাহীন শিক্ষকরা এ রাজনৈতিক ছাত্রদের ব্যবহার করতে শুরু করে। ছাত্ররাও শিক্ষকদের বিভিন্ন পদ-পদবি পাইয়ে দেয়ার আশ্বাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-হলে আধিপত্য বিস্তার শুরু করে।

নতজানু প্রশাসনের কারণে এ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে টেন্ডার ও চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়ে। শিক্ষকদের তোষামোদী ও আশকারা পেয়ে ছাত্ররা ক্রমশ শক্তিশালী ফ্রাঙ্কেনস্টাইন দানবে পরিণত হয়। এরই ফলে এরা প্রত্যেক হলে গড়ে তোলে নিজস্ব বাহিনী। ভীরু, তোষামোদকারী, দুর্নীতিবাজ শিক্ষকরা এদের ভয়ে তখন আর কোনো কিছু বলতে পারে না। তাই ছাত্ররা হয়ে ওঠে একেকজন প্রভাবশালী, গাড়ি-বাড়ি, অস্ত্রধারী বড় ভাই। আর সেই মুহূর্তে এদের ব্যবহার করতে থাকে রাজনৈতিক দলের বড় বড় নেতা ও মন্ত্রীরা। এমনকি সিভিল প্রশাসনের লোকজন ও পুলিশও বড় বড় পদ-পদবি পাওয়ার জন্য এদের ব্যবহার করতে থাকে।

ফলে আদর্শহীন শিক্ষক, পুলিশ, প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী এবং এ অস্ত্রধারী ও প্রভাবশালী ছাত্ররা হয়ে যায় একাকার- 'একই বৃত্তে শতফুল'। তাই হলে হলে তৈরি হয় টর্চার সেল। প্রশ্ন হল, বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন থাকবে গণরুম, কেন একজন ছাত্র দূরদূরান্ত থেকে এসে ভর্তি হয়ে হলে থাকার অধিকার পাবে না? দলবাজ, নীতিহীন, মেধাহীন শিক্ষকরা একবারও ভাবেন না- এই ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের কোল ছেড়ে সুদূর তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়, টেকনাফসহ ৬৪টি জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভর্তি হয়, তখন তাদের প্রয়োজন আশ্রয়, অভিভাবক ও সহমর্মিতা।

একজন অভিভাবক হিসেবে শিক্ষকদের উদ্দেশে আমি বলব, আমি তো একজন মেধাবী সন্তানকে ১৮ বছর লালন-পালন করে আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম, আপনারা তাকে পরবর্তী চার বছরে মানুষের মতো মানুষ করবেন, শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে শ্রেষ্ঠ সম্পদ তৈরি করবেন, আলোকিত মানুষ তৈরি করবেন বলে। যে আলোর বিচ্ছুরণে দেশ ও জাতি এবং সারা বিশ্ব আলোকিত হবে। কিন্তু এমন কী হল, এক-দুই বছরের মাথায় আমার মেধাবী সন্তানটি হয়ে গেল দানব? আমার ছেলেটি ছিল কোমলমতি কিশোর, আপনাদের অভিভাবকত্বে তার হাতে কলমের বদলে অস্ত্র কীভাবে উঠে এল? বই-খাতার বদলে টেন্ডারের কাগজ কীভাবে উঠে এল? কীভাবে তারা সহপাঠী আবরারকে ৬ ঘণ্টা পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করল? এসব প্রশ্ন আজ আপনাদের আমি করছি। আমি জানি উত্তরটা আপনারা দেবেন না।

আমিই দিচ্ছি। আপনারা শিক্ষকরা পদ-পদবির জন্য কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করে বেড়ান। শিক্ষক রাজনীতি করে আপনারা এক শিক্ষক আরেক শিক্ষকে লাঞ্ছিত করেন। ভিসি, প্রক্টর, প্রভোস্ট, হাউজ টিউটর এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ-পদবির জন্য আপনারা ক্ষমতাবানদের ব্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়ান। ক্ষমতাসীন মন্ত্রী এবং রাজনৈতিক নেতাদের অধীনস্থদের পর্যন্ত পদলেহন করেন। বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা, বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর, চেয়ারম্যান ও উপদেষ্টার পদ পান। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বড় বড় কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন। বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে 'খ্যাপ মারতে' চলে যান। পদ-পদবির জন্য বিভিন্ন প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগে ব্যস্ত থাকেন।

আমার জানামতে, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৫০ জন শিক্ষকের এনজিও আছে অথবা এনজিওর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ এনজিও প্রোগ্রামে দেশ-বিদেশে আপনারা প্রায়ই ২০-২৫ দিন অবস্থান করেন এবং সবচেয়ে অবাক কাণ্ড- নিজেদের এনজিওর ভিজিটিং কার্ডটি ব্যবহার না করে দেশে-বিদেশের বিভিন্ন সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডটি ব্যবহার করে বিশেষ সুবিধা অর্জন করেন। আমি এর জ্বলন্ত সাক্ষী।

আমারও একটি গবেষণা এনজিও রয়েছে। আমি গবেষণার সুযোগ না পেয়ে এবং রাজনৈতিক দলভুক্ত হতে চাইনি বলে দেশের একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করি। একটি গবেষণা এনজিও প্রতিষ্ঠা করি। আমার আরেক শিক্ষকও '৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করে একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আজ একজন আন্তর্জাতিক মানের পরিবেশ বিজ্ঞানী। আপনারা শুধু এনজিওর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা বানান। দেশ ও দশের কোনো উপকারে আসেন না। ওটঈঘ নামে একটি আন্তর্জাতিক এনজিও সংস্থা আছে, বাংলাদেশে যার ১৯টি প্রতিষ্ঠান আছে।

তার মধ্যে তিনটি হল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের, যারা চাকরিও করেন, আবার কনসালটেন্সি করেন এবং এনজিও করেন। এই যদি হয় শিক্ষক হিসেবে আপনাদের কর্মকাণ্ড, তাহলে আপনারা কী করে আমার সন্তানের অভিভাবক হবেন, কখন পড়াবেন আমার সন্তানকে? কখন বলবেন ক্লাসে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার কথা, মানুষের মতো মানুষ হওয়ার কথা? কখন আপনি প্রভোস্ট বা হাউজ টিউটর হিসেবে হল পরিদর্শন করবেন, টর্চার সেল দেখবেন?

কখন আমার ছেলেটির সুবিধা-অসুবিধা দেখবেন, র‍্যাগিংয়ের খবর নেবেন? আপনি পরের দিনের ক্লাস প্রস্তুতি না নিয়ে, নতুন নতুন তথ্যসমৃদ্ধ ক্লাস নেয়ার চিন্তা না করে, টিচার্স ক্লাবে আড্ডা দিতে অথবা টক শোতে দৌড়াতে থাকেন। এ ধরনের শিক্ষকদের কারণেই ছাত্ররা দয়া-মায়াহীন এক অমানবিক দানবে পরিণত হয়েছে।

আমি এ লেখাটি কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে লিখিনি। ৭ অক্টোবর থেকে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে; আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অবস্থা দেখে ভীত, সন্ত্রস্ত, ক্ষুব্ধ ও হতাশ। আমার দুই সন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, আমি ভেবে আতঙ্কিত হই- আমার ছেলেরা যদি হলে থাকত, তাহলে কি তাদের এই পরিণতি হতো? আজকাল আগের মতো আত্মীয়স্বজনের বাসায় ছাত্ররা উঠতে পারে না। তাছাড়া ব্যাচেলারদের রুম ভাড়া দেয়া হয় না। রুম ভাড়া নিলেও তারা অভিভাবকহীনভাবে থাকে। এ বয়সটা এমনই বয়স, তারা আরও বখে যেতে পারে।

আমি তাই আজ জোর দাবি তুলছি- এখন তো '৫২, '৬২, '৬৯, '৭১, '৯০ নেই। তাই প্রথমে শিক্ষক রাজনীতি এবং তারপর ছাত্র রাজনীতি সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধ করে দেয়া উচিত। ছাত্রদের নিজস্ব অধিকার আদায়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য ছাত্র সংসদগুলো আবার ফিরে আসুক। মনে রাখতে হবে, ওবামা, বিল ক্লিনটন, মাহাথির মোহাম্মদ, জাস্টিন ট্রুডো- কেউ ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে বিশ্বনেতা হননি। সুতরাং নেতা তৈরির কারখানার জন্য ছাত্র রাজনীতি রাখতে হবে- এ ধরনের খোঁড়া যুক্তি আর চলবে না। সময়ের বিবর্তনে, সময়ের প্রয়োজনে নেতা তৈরি হবে।

ড. ফেরদৌসী বেগম : বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান লেখক পুরস্কারপ্রাপ্ত (২০০৬) উদ্ভিদ প্রযুক্তিবিদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।